বিশ্বময় মানবতার বিপর্যয়

কবি নজরুল লিখেছিলেন, 'পাতাল ফেড়ে নামব নিচে, উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে/ বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।' কবির স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। বিশ্ব-জগৎ হাতের মুঠোয় পুরে দেখতে পাচ্ছি। এটা আমাদের টেকনোলজি, যোগাযোগব্যবস্থা ও বিজ্ঞানের অবদান। আমরা গ্লোব্যাল ভিলেজে বসবাস করছি– বিশ্বায়নের এই যুগে একথা আমাদের মুখে প্রায়ই উচ্চারিত হয়। হাতের মুঠোয় পুরে দেখতে গিয়ে কোথায় কি হচ্ছে ঘটনাসহ ছবিও দেখতে পাচ্ছি। ঘটনার বর্ণনা ও ছবি দেখে কখনো চমকে উঠতে হয়। মানব সভ্যতার এ আবার কোন ভয়ঙ্কর ও অভিশপ্ত রূপ! আমরা আসলেই কি মানুষ? যদিও আমরা সবাই নিজেদের মানুষ বলে দাবি করি। বিদেশ-বিভূঁইয়ের একজনের হাসি অন্য দেশের কাউকে হাসায়, এক দেশের কারো কান্না অন্য দেশের কাউকে কাঁদায়।

আমি একজন শিক্ষক। আমার ক্লাসে দুজন ফিলিস্তিনি ছাত্র পড়ে, তাদের বাড়িঘর, মা-বাপ কেমন আছে জিজ্ঞেস করি। তাদের কষ্ট আমাকে কাঁদায়। কয়েকজন নাইজেরিয়ান ছাত্র আছে। তাদের সাথে নিয়মিত ভালো-মন্দ ভাব-বিনিময় করি। আছে ভুটানের ছাত্র। সবাইকে আপন ভাবতে শিখেছি। ছাত্র-ছাত্রীকে আপন করে ভাবাই শিক্ষকের স্বভাব ও নৈতিক দায়িত্ব। প্রতি বছর ক্লাসে কোনো না কোনো ভিনদেশি ছাত্র পাই। এদেশে মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রই বেশি আসে। অন্য দেশে সে-দেশ এবং ইউরোপের ছাত্রছাত্রী বেশি পেয়েছি। তাদের খোঁজ-খবর না নিতে পারলে মনটা ভালো থাকে না। তাদের কষ্ট আমার মনকে পীড়া দেয়। তাহলে প্রত্যেক দেশ পরিচালকরা বিশ্বের পুরো জনগোষ্ঠীকে আপন ভাবতে পারে না কেন? তারা কি মানববিদ্বেষী, মানবতাবিরোধী? বিশ্বের তাবৎ জনগোষ্ঠীকে নিজের দেশের জনগোষ্ঠীর মতো আপন ভাবতে শিখলে অসুবিধা কোথায়? বিশ্ব নিরাপদ থাকবে, কি বিশ্ববাসীর নিরাপত্তা সমূলে ধ্বংস হবে– সবই তো তাদের হাতে। তারা ইচ্ছে করলে কোনো না কোনো মহাদেশ এক নিমিষে ধ্বংস করে দিতে পারে, বিরাণ প্রান্তরেও পরিণত করতে পারে; যদিও সব দেশের সক্ষমতা সমান নয়।

কয়েকদিন আগে আমার এক সহকর্মীর মনটা খুব খারাপ দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, মন খারাপের কারণ কী? তিনি বললেন, তাদের ঘরে একটা পোষা বিড়াল ছিল। বিড়ালটা ছিল তার ছোট মেয়ের খুব প্রিয়। রাতে বিড়ালটা মারা গেছে। মেয়েটা সকালে উঠে খুব কান্নাকাটি করছে। তার মনটাও সেজন্য খারাপ। একদিকে বিড়ালের মৃত্যু, অন্যদিকে মেয়েটার কান্নাকাটি। আমরা মানুষ। এ সবকিছুই আমাদের মানবতাবোধ থেকে এসেছে, যাকে আমরা মনুষ্যত্ববোধও বলি। শুধু মানুষ কেন, যে কোনো প্রাণীর প্রতিও আমাদের মমত্ববোধ আছে, যেমন প্রতিটা পশুর স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি আছে। এসব আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। শিল্পী গান গেয়েছেন, 'মানুষ মানুষের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না, ও বন্ধু...'। এ সৃষ্ট চরাচরে বাঁচতে গেলে, চলতে গেলে সৃষ্টির সবকিছুকে আপন ডোরে বেঁধে ফেলতে হয়। অন্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। নইলে নিজে বাঁচা যায় না। সবকিছু মিলিয়েই আমাদের এ বিশ্ব সংসার। এ মমত্ববোধে আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। এ মনুষ্যত্ববোধ আমাদের শাশ্বত ও অন্তর্নিহিত। মনুষ্যত্ববোধ আমাদের আছে বলেই আমাদের মানুষ বলা হয়। মনুষ্যত্ববোধ না থাকলে কি আমরা মানুষ নাম ধারণ করতে পারতাম? প্রত্যেক মানুষ– রাজা-বাদশা, আমির-ফকির, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, এমনকি একজন পথের ভিখারিরও মানবতাবোধ আছে বলে আমরা বিবেচনা করি। মানবতাবোধ না থাকলে কীভাবে মানুষ হয়! বিশ্বের প্রত্যেক মানুষেরই হাসি-কান্নার ধরন এক, ব্যথা-বেদনা, একই অভিব্যক্তি।

মানুষ যেদিন আগুন জ্বালাতে শিখেছে, সেদিন থেকে সভ্যতার সূত্রপাত। আমরা গর্ব করে বলি, মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। মানুষের সীমাহীন প্রচেষ্টা, মানবতাবোধ ও বিজ্ঞান আমাদের সভ্যতা দিয়েছে। কোনো কোনো বিষয় নিয়ে ভাবলে আমার সন্দেহ হয়, আসলেই কি মানব-সমাজ সভ্যতা অর্জন করেছে? মানুষ সভ্যই যদি হবে, তবে কেন এই আদিম নৃশংসতা, পশুসুলভ হিংস্রতা, আত্ম-অহংবোধ, উদগ্র জিঘাংসা, এত নির্লজ্জ একচোখা স্বার্থপরতা, পারস্পরিক প্রতিহিংসা, ধর্মীয়-রাজনৈতিক বৈষম্য, মারণাস্ত্রের ব্যবসা? হিংস্রতা প্রকাশের জন্য পশুর নখর আছে, মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের নামে কৃত্রিম নখর তৈরি করে নিয়েছে। মানুষের মধ্যে যখন মনুষ্যত্ব লোপ পায়, তখন কৃত্রিম নখর

ব্যবহার করে। সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের দুর্দশার কারণ হয়। নারি-শিশুসহ জনপদের পর জনপদ ধ্বংসলীলা ঘটায়। কোনো কোনো মানুষ একাজ করে আত্মতৃপ্তি পায়, দাম্ভিকতা প্রকাশ করে; এতে একদল অসহায় মানুষ পৃথিবীর এই ক্ষণিক লীলাভূমি থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পিছনে তাকানো মানবজাতির স্বভাব নয়। আমরা বিবেকের দংশন ও অনুশোচনা ভুলে দ্রুত সামনে ধেয়ে চলি। মনুষ্যত্বের অভিশাপ পিছনে পড়ে থাকে। এটা কি মানবসভ্যতার জন্য গ্লানিকর ও কলঙ্কজনক নয়? যে যা-ই করুক ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। কত ক্ষমতাধর দিগ্বিজয়ী, কৌশলী তলোয়ারচালক, পারমাণবিক বোমাবর্ষণকারী– কেউ-ই এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী আসন গাড়তে পারেনি। কী জানি কীসের টানে আমরা পৃথিবী ছেড়ে নির্দিষ্ট সময় শেষে অনন্তের উদ্দেশ্যে বিদায় নিই। কোথায় যায় তার খোঁজ কেউ কোনোদিন রাখে না। শেকসপিয়র তার টেমপেস্ট কাব্যে লিখেছিলেন, 'The cloud-capped towers, the gorgeous palaces,/ The solemn temples, the great globe itself,/Yea, all which it inherit, shall dissolve; And like this insubstantial pageant faded,/ Leave not a rack behind.' কেবল পিছে পড়ে থাকে চিন্তা-চেতনা ও কর্ম। তবুও আমাদের স্বজাতি নিধনের এত দাম্ভিকতা কেন?

মানবতার এ বিপর্যয় বিশ্বময়। দিন যত সামনে এগোচ্ছে, সভ্যতার অতিকথন তত ম্লান-বিশীর্ণ হয়ে অতীতের হারানো পথে মুখ লুকাচ্ছে। এসবই বিশ্ব-বাস্তবতা। ১৯৪৮ সালে আমেরিকা ও ব্রিটেন মিলে মধ্যপ্রাচ্যে একটা ইসরাইল রাষ্ট্র নামের বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল যা ফিলিস্তিন সমস্যা নামে খ্যাত। আরব জনগোষ্ঠীর বাপ-দাদার ভিটে থেকে তাদের উচ্ছেদ করে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম। এই বিষবৃক্ষ সেই থেকে ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিষ উদগীরণ করে চলেছে এবং বিশ্বময় বহু নতুন সমস্যার জন্ম দিয়েছে। ব্রিটিশ-আমেরিকাসহ মিত্রদের একচোখা মানবতাবিবর্জিত নীতির কারণে মানুষে মানুষে বিভেদ বেড়েছে। মানবতার ভিত ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, চেরাগ আলীর ঘোড়া'। ইসরাইল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও ক্রমেই বসতি গড়ে দখলে নিচ্ছে। তারা ফিলিস্তিনিদের পূর্ণ উচ্ছেদ চায়। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রই বলছে, পাশাপাশি দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে দিলেই বিবাদটা আপাতত মিমাংসা হয়ে যায়। না, তা হওয়া চলবে না। সাথে বিশ্ব-মোড়লদের একচোখা সমর্থন আছে না? তারা বিষয়টাকে ধর্মীয়-রাজনৈতিক বিবাদ হিসেবে বিবেচনা করছে। তাই বিষয়টাকে নানা অজুহাতে ঝুলিয়ে রাখতেই হবে। সাথে আছে রূপকার্থে ব্যবহৃত এ যুগের দজ্জালসদৃশ আমেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ট্রবলয়। এদের দ্বৈতরূপী ভূমিকা বিশ্বময় সকল অশান্তির মূল কারণ। মানবতার ধ্বজাধারী মানবসভ্যতা-বিনাশী অপশক্তি। ইতিহাস অন্তত তা-ই বলে। বিশ্ব-মোড়লদের ইতরপনা কার্যকলাপ ও চিন্তাভাবনা এর জন্য একমাত্র দায়ী।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পুরোধা-শক্তি রাশিয়া ও চীন মানবতা-বিরোধী আরেক অপশক্তি। সমাজতন্ত্রের নামাবলীতে এ বিশ্বে কত কোটি অসহায় মানুষের যে হত্যাযজ্ঞ ইতোমধ্যেই সংঘটিত হয়েছে, এর কোনো ইয়ত্তা নেই। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ভ্লাদিমির পুতিন কোনো অবস্থাতেই ভুলতে পারছেন না। ইতিহাসের অনেক ঘটনাপ্রবাহ গড়িয়ে ২০২২ সালে পুতিন ইউক্রেনিয়ার সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হন, একাংশ দখলও করে নেন। সেখানে মানবতার বিপর্যয় অবিরাম চলছে। অস্ত্রের ঝনঝনানি ও বিভিন্ন রকমের বোমা-মিসাইল সাধারণ মানুষের সুস্থ ও সাধারণ জীবনযাপনকে দুর্বিসহ ও কখনো নিঃশেষ করে দিচ্ছে। মানুষ হয়ে মনবজাতির ধ্বংসলীলা মানসিক বিকৃতির শামিল। চীন উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বসম্প্রদায় নিশ্চুপ। মানবতা বিপর্যস্ত, সততা ও আত্মজিজ্ঞাসা অপসৃত।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের ঘোড়ারোগে ধরেছে। বিজেপি নামক মৌলবাদী সরকারের প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় ভারত উপমহাদেশব্যাপী রামরাজত্ব কায়েম করতে চায়– নাম দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র। তাদের তৈরিকৃত মনগড়া মানচিত্র থেকে পার্শ্ববর্তী দেশের নামনিশানা মুছে ফেলতে চায়। ফলে আরেক মানবিক বিপর্যয় সামনের দিকে ধেয়ে আসছে। হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের দোহায় দিয়ে সেখানে শত শত বছর ধরে বসবাসকারী মুসলমানদের ওপর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন অবিরাম চলছে। চলছে নির্বিচার গণহত্যা। মুসলমানরা নিজ দেশে পরদেশী, অথচ হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে লিখিতভাবে দাবি করে, বাস্তবে 'ধর্মঅহিংস' রাষ্ট্রের ঠিকানা বিলীনের পথে।

বাস্তবতা হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের জনগণের সাথেই ভারত নামের রাষ্ট্রের সদ্ভাব-সুসম্পর্ক নেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী আরেকটা দেশের নাম মিয়ানমার। সেখানেও জাতিগত সংঘাত। মানবিকতা বিপর্যস্ত ও পরাজিত। শত শত বছর ধরে বসবাসকারী নাগরিক রহিঙ্গারা আজ সেদেশে বাস্তুহারা, সামরিক জান্তার অত্যাচার ও নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের কারণে ঘর-বাড়ি ফেলে আজ আমাদের দেশে আশ্রিত হিসেবে তাঁবুতে বসবাসরত, মানবেতর জীবনযাপন করছে তারা। তাদের ভবিষ্যৎ বেঁচে থাকার স্বপ্ন দুরাশার এক-ফালি চাঁদের মতো অসীম আকাশের কোনো এক দিগন্তে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে! এখানেও মানবজাতি ও মানবতার পরাজয়। লালন গেয়েছিলেন, 'কেউ মালা কেউ তসবিহ গলে, তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে, যাওয়ার কিংবা আসার কালে জাতের চিহ্ন রয় কারে...'।

মানবতার পরাজয়ের ইতিহাস কয়টা বলবো! মানবজাতির ইতিহাসই অনেকাংশে মানবতার পরাজয়ের ইতিহাস। মানবজাতির পরাজয় মানবতা-সংহারক বিকৃত চিন্তা-চেতনার মধ্যে নিহিত। বিশ্বে এমন কোনো রাষ্ট্রের নাম আমার জানা নেই, যেখানে মাত্র একটি ধর্মের লোক বসবাস করে। তাহলে কেন ধর্মীয় ভিত্তিতে মানুষের বিভাজন, সবলে উচ্ছেদ? কেন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ভিন্ন চোখ দিয়ে ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে দেখে? এ কেমন মানবতা ও মানবতাবোধ! রাষ্ট্রের কাছে সব ধর্মের জনগোষ্ঠীর সমান অধিকার। রাষ্ট্রনায়কদের মনের কাছেও তাই-ই হওয়া উচিত। অথচ তাদের অনেকেরই ক্ষমতার দাপট, 'মুখে মধু পেটে বিষ'। ভাবতে পারি না, সভ্যতার নামে মানবজাতির এহেন অসভ্যের গ্লানি কেন পেয়ে বসবে। দেখা-চোখে এ ধরাপৃষ্ঠে মানবজাতির পরিণতি আরো অনেক করুণ, ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর হবে বলে মনে হয়। গলদটা কোথায়? সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে ও মানবজাতিকে সুস্থ ও শান্তির সাথে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' শব্দটাকে আরো পরিবর্তনশীল ও মানবসভ্যতার উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিয়েছে।

জাতিসংঘ নামের যে বিশ্ব সংস্থা আমরা তৈরি করে রেখেছি, সেটাও বিশ্বব্যবস্থায় তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছে না। চলতে হচ্ছে কোনো কোনো বিশ্ব-মোড়লদের অঙ্গুলিহেলনে। এটা দুঃখজনক। আমরা জাতিসংঘের বিভিন্ন নিয়মকানুন ও ব্যবস্থাপনা শুধু পাঁচ মোড়লের ওপর নির্ভর না করে ঢেলে সাজাতে পারি। বিশ্বের মানবতাবাদী শক্তিকে সরব হয়ে উঠতে হবে। মানবতাবাদী আন্দোলন হতে হবে বিশ্বব্যাপী। তাহলেই বিশ্বে অনেকটা শান্তি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বস্তি চলে আসবে। এটা নিয়ে আমরা ভাবি না। ভেটো প্রদানের ক্ষমতা রদ করতে হবে। প্রতিটা স্বাধীন দেশ জাতিসংঘের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে সব অধিকার ভোগ করবে। বিশ্বব্যবস্থার প্রতিটা সঙ্কট সমাধানে সব সদস্যের সরাসরি ভোটদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শুধু পাঁচ ভেটো প্রদানকারি দেশের নেতৃত্ব বদল করে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির ভিত্তিতে সব সঙ্কটের সমাধান করতে হবে। যে কোনো দেশ জাতিসংঘের নির্দেশনা ও সমাধান মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর জন্য এ বিশ্বব্যবস্থা ও পরিচালনার অযোগ্য এমন কিছুই নেই, সবই সম্ভব। এসব কাজে শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর নির্ভর না করে আরো যথাযোগ্য অসংখ্য মানবপ্রেমী পেশাদারের ওপর জাতিসংঘের বিদ্যমান সিস্টেম ও নিয়মাবলি বদল এবং সিস্টেম ও নিয়মাবলি পুনর্নির্মিত, পুনর্যাত্রা ও পুনর্গঠিত করে ঢেলে সাজানো যায়। এতে সমষ্টিগতভাবে মানবজাতি যে দারুণভাবে উপকৃত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সব আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিবাদ-বিসংবাদ পেছনে ফেলে এ বিশ্বকে বসবাসের উপযুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য এর কোনো বিকল্প অন্তত আমি দেখি না।

(১৫ মে ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ